আমরা কেন মুসলমান?

আমরা কেন মুসলমান?

লেখক
ড. খালেদ সালিম আবদুল ফাত্তাহ

সদরুল আমীন সাকিব
অনূদিত ও সংক্ষেপিত

নীরিক্ষণ
আবদুল্লাহ বিন বশির

চেতনা
প্রকাশন

বই : আমরা কেন মুসলমান
লেখক : ড. খালেদ সালিম আবদুল ফাত্তাহ
অনুবাদ : সদরুল আমীন সাকিব
নীরিক্ষণ : আবদুল্লাহ বিন বশির
প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০২৩
প্রকাশনা : ৪২
প্রচ্ছদ : আহমাদুল্লাহ ইকরাম
বানান ও সজ্জা : সাহিত্যসারথি (ssa.pyhood.com)
প্রকাশনায় : চেতনা প্রকাশন
দোকান নং : ২০, ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
পরিবেশক : মাকতাবাতুল আমজাদ, মোবাইল : ০১৭১২-৯৪৭৬৫৩
অনলাইন পরিবেশক : উকাজ, রকমারি, ওয়াফিলাইফ, নাহাল, সমাহার, পরিধি

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

মুদ্রিত মূল্য : ৫৩৪ টাকা মাত্র

Amra Keno Mussolman by Dr Khalid Saleem Abd Al-Fattah
Published by Chetona Prokashon.
e-mail : chetonaprokashon@gmail.com
website : chetonaprokashon.com
phone : 01798-947 657; 01303-855 225

ISBN : 978-984-98011-1-5

সূ চি প ত্র

আলোচনাসংক্রান্ত জরুরি কিছু ভূমিকা

ভূমিকা : ১..... ০
ভূমিকা : ২..... ০০
ভূমিকা : ৩..... ০
ভূমিকা : ৪..... ০০

প্রথম অধ্যায়

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের
নবুয়তের প্রামাণিকতা

ভূমিকা..... ০০

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহর রাসুল প্রেরিত হওয়ার সুসংবাদ ও তার প্রেরণকাল সম্পর্কিত
ব্যাপক বর্ণনা ও অবগতি..... ০০
ব্যাপক বর্ণনা ও অবগতি..... ০০
যুগ প্রাসঙ্গিকতা..... ০০
বিগত আসমানি কিতাবসমূহে শেষ নবি আগমনের সংবাদ উপস্থিতির যৌক্তিকতা০০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নবুয়তপূর্ব আশ্চর্য ঘটনাবলি ০০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নবুয়তপূর্ব জীবনাচার..... ০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চারিত্রিক পূর্ণতা..... ০০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গঠনবৈশিষ্ট্যগত পূর্ণতা ০

দেহকাঠামো..... ০০
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
নিরক্ষরতা..... ০০
সপ্তম পরিচ্ছেদ
বিস্ময়কর বিশুদ্ধ ভাষা..... ০০
অষ্টম পরিচ্ছেদ
অনাড়ম্বর জীবনযাপন..... ০০
নবম পরিচ্ছেদ
আজীবন শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্র থেকে নিরাপদ থাকা ০০
দশম পরিচ্ছেদ
নিজের নেয়ামত ও মুজেজাকে সর্বদা আল্লাহর প্রতি সম্পৃক্ত করা ০০
একাদশ পরিচ্ছেদ
সর্বপ্রকার কষ্ট-নির্যাতনের সামনে সবর ও ধৈর্য অবলম্বন ০০
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ
নিজের নবুয়তের ব্যাপারে দৃঢ়বিশ্বাস ০
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
আল্লাহ তায়ালার তিরস্কার ০০
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ
নবিজির ওপর আরোপিত অপবাদসমূহের আলোচনা ও তার খণ্ডন..... ০
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ
কিছু বিষয়ে অনবগতি প্রকাশ..... ০
ষোড়শ পরিচ্ছেদ
প্রয়োজনীয়তাসত্ত্বেও কিছু ক্ষেত্রে উত্তর প্রদানে বিলম্ব..... ০০
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ
ওহি নাজিলের সময় দেহে সুস্পষ্ট চিহ্ন ফুটে ওঠা..... ০
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ
ইবাদত ও আল্লাহভীতি ০০
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ
বিভিন্ন আশ্চর্য ঘটনা ও প্রচলিত জ্ঞানবিরোধী সংবাদ জানানো ০০

বিংশ পরিচ্ছেদ
নবিজির হাতে প্রকাশিত বরকতসমূহ ০০
একবিংশ পরিচ্ছেদ
নবিজির বরকতে খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া ০০
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ
নবিজির বরকতে পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া ০০
ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ
নবিজির দোয়া কবুল হয়ে যাওয়া ০০
চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ
বাকশক্তিহীন প্রাণীর পক্ষ থেকে নবুয়তের সাক্ষ্যপ্রদান ০০
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ
নবিজির সাথে জড়পদার্থের কথোপকথন ০
ষষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ
মুসলিমদের মধ্যে নবিজি ও ইসলামের প্রভাব (পরিচর্যাগত অলৌকিকতা) ০০
সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ
অধিক শত্রুসেনার ওপর মুসলিম শিবিরের বিজয়লাভ ০
অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ
সমস্ত জাতি ও ধর্মের প্রতি নবিজির বিরোধিতা এবং সকলকে পরাজিত
করার হুমকি ০০
ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ
সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রকাশিত কারামতসমূহ ০০
ত্রিংশ পরিচ্ছেদ
মানুষের মনের গোপন কথা জানিয়ে আল্লাহর রাসুলের বর্ণনা ০০
একত্রিংশ পরিচ্ছেদ
তৎকালীন কিছু অজানা তথ্য জানিয়ে নবিজির সংবাদ প্রদান ০০
দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ
কিছু সময় পরে ঘটিতব্য বিষয় জানিয়ে নবিজির ভবিষ্যদবাণী ০০
ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ
নবিজির মৃত্যুর পর ঘটিতব্য কিছু ঘটনা ও বিজয়ের ভবিষ্যদবাণী ০০

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ
হাদিস শরিফে মানবসংক্রান্ত কিছু অলৌকিক সংবাদ..... ০০

দ্বিতীয় অধ্যায়

কুরআনের আসমানি সত্যতা

ভূমিকা..... ০
প্রথম পরিচ্ছেদ
মানবাত্মার ওপর কুরআনের প্রভাব ও তার আত্মসমর্পণ ০০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
অস্বীকারসত্ত্বেও হৃদয়ের ওপর কুরআনের প্রভাব ০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ
কুরআনের বর্ণনাগত অলৌকিকতা..... ০
চতুর্থ পরিচ্ছেদ
কুরআনের উপস্থাপনাগত অলৌকিকতা ০০
পঞ্চম পরিচ্ছেদ
কুরআনের খণ্ডনমূলক গ্রন্থ উপস্থাপনে আরবজাতির ব্যর্থতা ০
আলোচিত দৃষ্টিকোণ থেকে নবুয়তের প্রামাণিকতাসংক্রান্ত কিছু দিক ০০
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
কুরআন একমাত্র আল্লাহর প্রতি সম্বন্ধিত..... ০০
সপ্তম পরিচ্ছেদ
নবিজির ইনতেকালের কয়েক মাস পূর্বে কুরআন নাজিলের সমাপ্তি ০০
অষ্টম পরিচ্ছেদ
কুরআনের ঐতিহাসিক অলৌকিকতা ০০
নবম পরিচ্ছেদ
সুরার আঘাতসমূহের মাঝে বিস্তর ব্যবধান..... ০০
দশম পরিচ্ছেদ
আয়াতের শক্তিতে ব্যবধানহীনতা ০০
একাদশ পরিচ্ছেদ
নবিদের ঘটনা বর্ণনায় তাওরাত-ইনজিলের সাথে কুরআনের সাদৃশ্য..... ০০

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

হুরুফুল মুকাত্তাআতের ব্যবহার..... ০

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কুরআন বর্ণনায় নবিজির জবান ও স্মৃতি সুরক্ষিত থাকা..... ০০

অতীত ও ভবিষ্যতের বিভিন্ন ঘটনা বারবার নির্ভুলভাবে বর্ণনা করা..... ০

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ওহির মাঝে মক্কি-মাদানি, এবং কুরআন, হাদিসে কুদসি ও সাধারণ

হাদিসের মাঝে সাহিত্যগত পার্থক্য..... ০০

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

নবিজির প্রতি কুরআনের নির্দেশসমূহ..... ০০

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

কুরআনুল কারিমে পূর্ববর্তী নবিগণের বর্ণনাধিক্য..... ০০

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

কুরআনুল কারিমে আহলে কিতাবদের বর্ণনাধিক্য ০০

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

কুরআনের কিছু ভবিষ্যদবাণী ০০

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

মানুষের মনের কথা জানিয়ে কুরআনের বর্ণনা ০০

বিংশ পরিচ্ছেদ

কেউ কেউ কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে বলে কুরআনের ইঙ্গিত..... ০০

তৃতীয় অধ্যায়

নীতিমালা ও বিধানের আলোকে ইসলামের সত্যতা

ভূমিকা..... ০

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলাম মানবের স্বভাবজাত বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করে ০০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সকল নবির ধর্ম ইসলাম..... ০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মানবজাতির স্বভাবধর্ম ইসলাম ০

সামাজিক দায়িত্বপালনে নারী-পুরুষ..... ০০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মানবজাতির জন্য ইসলামের প্রয়োজনীয়তা ও আবশ্যকতা ০

বুদ্ধিবৃত্তিকেন্দ্রিক প্রয়োজনীয়তা..... ০০

জীবনপদ্ধতিকেন্দ্রিক প্রয়োজনীয়তা ০০

অর্থনীতিকেন্দ্রিক প্রয়োজনীয়তা ০০

নৈতিকতা ও আচরণকেন্দ্রিক প্রয়োজনীয়তা..... ০০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইসলামের সুমহান নীতি ও মূল্যবোধসমূহ..... ০০

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইসলামের আকিদাবিশ্বাস..... ০০

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইসলাম নামের অর্থ নিয়ে ভাবনা..... ০০

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মধ্যপন্থী দ্বীন ইসলাম ০

সমাজে সম্পদবণ্টনের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা..... ০০

ইবাদত, জাগতিকতা ও বিবিধ বিষয়ের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা ০

নবম পরিচ্ছেদ

সমতাবিধানে ইসলাম..... ০০

দশম পরিচ্ছেদ

ইসলাম একমাত্র সত্য ও বাস্তব..... ০০

একাদশ পরিচ্ছেদ

ইসলামি শরিয়তের ব্যাপকতা..... ০০

ভূমিকা..... ০০

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বাস্তবতার সাথে ইসলামি শরিয়তের মিতালি ০০

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ইসলামি শরিয়তের সহজতা, দয়ামায়া, উদারতা ০০

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

বিধানপ্রণেতা হিসেবে প্রভুর প্রতি বিশ্বাস..... ০০

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ
শরয়ি বিধিবিধানের স্থিরতা..... ০
ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ
মন্দ ও নিকৃষ্ট বিষয় নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ ও উপকারিতা..... ০০
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ
শরিয়তে বিভিন্ন বিষয় নিষিদ্ধকরণসাপেক্ষে ইসলামের সত্যতা..... ০
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ
শরিয়তের ভিত্তি ও মূলনীতিসমূহের সংরক্ষণ..... ০
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ
শরিয়তের বিধান প্রবর্তনের লক্ষ্য ০০
বিংশ পরিচ্ছেদ
মতানৈক্যগ্রহণে ইসলামের অনুপম সক্ষমতা..... ০
একবিংশ পরিচ্ছেদ
ইসলামে রাজনীতি..... ০০
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ
অমুসলিম জিম্মিদের সাথে ইসলামের মানবিক ও উদার আচরণ..... ০০
ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ
জীবজন্তু প্রসঙ্গে ইসলামের নির্দেশনা..... ০০
চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ
ভিন্নধর্মের ধর্মীয় পুরুষ ও বৈজ্ঞানিকদের ইসলাম গ্রহণ..... ০০
ইহুদি রাব্বিদের ঘটনা..... ০০
খ্রিষ্টান পাদরিদের ঘটনা ০০
আধুনিক যুগের ঘটনা ০০
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ
মক্কার মুশরিকদেরও নবিজির নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস..... ০
ভণ্ড নবিদের পক্ষ থেকে নবিজির নবুয়তের স্বীকারোক্তি ০০
ষষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ
রোমান কায়সার ও মুশরিককালীন আবু সুফিয়ানের ঘটনা..... ০
পরিশিষ্ট ০০
গ্রন্থপঞ্জি ০০

আলোচনাসংক্রান্ত জরুরি কিছু ভূমিকা

ভূমিকা : ১

বর্ণনার ক্ষেত্রে উৎসগত বিশুদ্ধতা আর দাবির ক্ষেত্রে প্রমাণ আবশ্যক

এটি এক অবিসংবাদিত নীতি। কেউ যদি কোনোকিছুর দাবি করে, সেজন্য তার পক্ষে বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণ থাকা জরুরি। আর কেউ যদি কোনো তথ্য বর্ণনা করে, সেজন্য চাই উৎসের সাপেক্ষে বর্ণনাটির বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হওয়া।

তাই আমরা যখন কোনো দাবির স্বপক্ষে কুরআনে কারিম বা হাদিসে নববি থেকে প্রমাণ উপস্থাপন করব, তখন প্রমাণটির উৎস কুরআন হলে তা প্রকৃতপক্ষেই কুরআনের বর্ণনা কি না লক্ষ করতে হবে। আর উৎসটি হাদিস হলে, তা বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য বর্ণনার মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছেছে কি না সেটা দেখতে হবে।

কুরআন ও হাদিসের বিশুদ্ধতা

কুরআন ও হাদিস মুসলিম উম্মাহর নিকট অকাট্য প্রমাণ। সর্ববিষয়ে তারা এ উৎসদ্বয়ের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে থাকে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই উৎস দুটির ওপর হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তাই এদের বিশুদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতা যে আজও অটুট আছে, তার প্রমাণ কী, সে বিষয়ে অবগত হওয়া বেশ যৌক্তিক বটে। তাই আমরা সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করছি।

কুরআনুল কারিম

প্রামাণিকতার ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম উৎস কুরআনুল কারিম। নাজিল হওয়ার পর থেকে যুগপরম্পরায় এ গ্রন্থ হাজার হাজার মানুষ থেকে হাজার-লাখ মানুষ গ্রহণ করেছে এবং পরবর্তী প্রজন্মের লাখ-কোটি সদস্যের নিকট তা পৌঁছে দিয়েছে।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট হবে আশা করি। কেউ যদি সংবাদ দেয় যে, অমুক দেশে এই নামে একটি গ্রাম আছে, তখন তার সংবাদ বিশ্বাস করা

হবে—যদি ইতিপূর্বে তার সত্যবাদিতা পরীক্ষিত হয় এবং তার ব্যাপারে মিথ্যা বলার কোনো প্রমাণ না থাকে। এরপরে যদি একই সংবাদ আরেকজন ব্যক্তি প্রদান করে, তখন সে ব্যাপারে বিশ্বাসযোগ্যতার পারদ আরও ঊর্ধ্বে উঠে যাবে। তারপরে যদি সেই একই সংবাদ আরও দশজন এসে বলে, তখন তা একদম নিশ্চিত সত্যে পরিণত হবে এবং একে অস্বীকার করা পাগলামো ছাড়া কিছু বলা হবে না। যেমন বিংশ শতাব্দীর প্রতিটি মানুষ কেবল শোনার ভিত্তিতেই বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীতে আমেরিকা নামের একটি দেশ রয়েছে।

একই ব্যাপার ঘটেছে কুরআনুল কারিমের ক্ষেত্রেও। এ গ্রন্থ রাসুলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শত শত নয়, বরং হাজার হাজার সাহাবি বর্ণনা করেছেন তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। এবং সেই প্রজন্ম থেকে বর্ণনা করেছে আরও লাখ লাখ মানুষ। ফলে তখন কি আমাদের আর কোনো সন্দেহ থাকবে, যখন উমর, উসমান, আলি, আবু মুসা আশআরি, মুয়াজ ইবনে জাবাল, যায়েদ ইবনে সাবেত, কিংবা আবু দারদা রা. বলেন যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এই আসমানি ওহির সংবাদ দিয়েছেন?!

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, তারা হয়তো আপন ধর্মের স্বার্থচিন্তায় সকলে একযোগ হয়েই মিথ্যা বলেছে! এর জবাবে আমরা বলব, তাদের প্রতি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা ছিল, মিথ্যা বলা পরিপূর্ণ অবৈধ, যদিও তা ধর্মের খাতিরে হয়; সাধারণ নয়, তা মহাপাপের অন্তর্ভুক্ত! তিনি আল্লাহ তায়ালার কুরআন এবং নিজের হাদিস উভয়ের মাধ্যমেই আমাদের এ তথ্য জানিয়েছেন। যেমন কুরআন থেকে তিনি বলেন,

> তার চেয়ে বড় জালেম কে হতে পারে, যে আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে, অথবা তাঁর আয়াতসমূহ অস্বীকার করে! (সুরা আনআম : ২১)

কুরআনের অন্যত্র এসেছে,

> তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে, অথবা এই দাবি করে—আমার প্রতি ওহি অবতীর্ণ হয়; অথচ মোটেও তার প্রতি ওহি অবতীর্ণ করা হয়নি!
>
> (সুরা আনআম : ৯৩)

অন্যত্র এসেছে,

> যেসব বস্তু সম্পর্কে তোমাদের জবান মিথ্যা রচনা করে, সে সম্পর্কে বলো না যে—'এটা হালাল আর এটা হারাম'; (কেননা, তার অর্থ হবে)

এভাবে তোমরা আল্লাহর নামে মিথ্যা অপবাদ দাও। নিশ্চয় যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা অপবাদ দেয়, তারা সফল হয় না।

(সুরা নাহল : ১১৬)

আরও বর্ণিত হয়েছে,

যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে, তারপর বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, তাদের জন্য ধ্বংস! (সুরা বাকারা : ৭৯)

অন্যদিকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেন,

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ওপর মিথ্যারোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।[১]

এ হাদিসটি মুতাওয়াতির, যা ১০০ থেকে অধিক সংখ্যক সাহাবি বর্ণনা করেছেন।

হাদিসে নববি

মৌলিকভাবে কুরআন ও হাদিস দুটিই ওহি এবং উভয়েরই আনুগত্য করা ফরজ। তবে বর্ণনাগত বিশুদ্ধতার দিক থেকে হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনে কারিমের মাঝে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। অর্থাৎ, পবিত্র কুরআনের পরিচয়ে আমাদের নিকট বর্ণনাকারীদের পক্ষ থেকে যা-কিছু পৌঁছেছে, তার পুরোটাই বিশুদ্ধ বর্ণনা ও নিখাদ ওহির বাণী। সেখানে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কুরআনে কারিমের ৬২৩৬টি আয়াতের মাঝে প্রতিটি কথা নিঃসংশয় ও নির্ভুল বর্ণনা। মক্কা, মদিনা, ইরাক, শাম, ইয়েমেন, বাহরাইনসহ যত অঞ্চলে সাহাবায়ে কেরাম ছড়িয়েছিলেন, প্রতিটি অঞ্চলে তারা একইরূপে কুরআন পাঠ করেছেন। পরস্পরের (মূল বর্ণনা ও তথ্যে কোনো ধরনের) বৈপরীত্য কিংবা কমবেশি ছিল না। অতএব, কোনো বিবেকবান মানুষের পক্ষে কি এ কথা কল্পনা করা সম্ভব যে, এই বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য বর্ণ, গোত্র ও বৈচিত্র্যের অধিকারী মানুষ একটি মিথ্যা বাণীর ওপর একমত হয়েছে?!

তবে হাদিসের বিষয় কিছুটা ভিন্ন; বর্ণনাগত বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে সকল হাদিস সমমানের নয়। সেখানে বিশুদ্ধ ও অশুদ্ধ উভয়প্রকার বর্ণনারই সম্মিলন ঘটেছে। তবে আল্লাহর বাণী যে, হাদিসের মাঝে শুধু সেসব বর্ণনাই প্রামাণ্য হিসেবে উপস্থাপিত হয়, যা বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। বস্তুত এই নীতি আমাদের মূল

---

১. *মুসনাদে আহমাদ*, (৫৮৪); *সহিহ বুখারি*, (১২৯১); *সহিহ মুসলিম*, (৩); *সুনানে ইবনে মাজাহ*, (৩০); *সুনানে তিরমিজি*, (২৬৫৯)।

শিরোনামেরও প্রতিনিধিত্ব করে। অর্থাৎ, বর্ণিত বাণীর প্রামাণিকতা তার বিশুদ্ধতার ওপর নির্ভর করা।

চলুন এবার আমরা দেখে নিই, হাদিসের বর্ণনার বিশুদ্ধতা জানার মাধ্যমগুলো কী কী। প্রকৃতপক্ষে বর্ণনার বিশুদ্ধতা নিরূপণের ক্ষেত্রে মুসলিমজাতির পক্ষ থেকে এক গুরুভার পদক্ষেপ ও সুমহান অবদানের উপস্থিতি মিলে। গোটা মানব ইতিহাসে এর কোনো নজির নেই। মুসলিমরা হাদিসের বর্ণনা গ্রহণের ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীর মাঝে দুটো গুণের উপস্থিতি খোঁজার প্রতি জোর দিয়ে থাকে। এ দুই গুণ উপস্থিত না থাকলে তাদের কাছে সেই বর্ণনা বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয় না। যথা :

১. عدالة الرواة বা বর্ণনাকারীদের ন্যায়পরায়ণতা

আল্লাহর প্রতি তার যথাযথ তাকওয়া ও ভীতি থাকতে হবে। কারণ, এ গুণের প্রভাবে সে মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকবে, কোনো হাদিসের বর্ণনায় ইচ্ছাকৃত বিকৃতি ঘটাতে সাহস করবে না। তাকওয়ার পাশাপাশি তার এ ব্যাপারেও স্পষ্ট জ্ঞান থাকা চাই যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসের মাঝে মিথ্যাচার করা মহাপাপ ও মহা অন্যায়। শাস্ত্রীয় ভাষায় গোটা বিষয়টির জন্য ব্যবহার করা হয় 'আদালাতুর রুওয়াত' (عدالة الرواة) বা বর্ণনাকারীদের ন্যায়পরায়ণতা।

২. ضبط الرواة বা বর্ণনাকারীদের আয়ত্তশক্তি

সে প্রখর স্মৃতিশক্তি ও উপস্থিত স্মরণশক্তির অধিকারী হওয়া চাই। হাদিসবিশারদ ওলামায়ে কেরাম বর্ণনাকারীদের মেধাশক্তি যাচাইয়ের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। যেমন, বর্ণনাকারীকে পরীক্ষা, তার পুরাতন বর্ণনা ও বর্তমান বর্ণনার মাঝে তুলনা, সুপ্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনার সাথে তার বর্ণনাকে তুলনা করে দেখা। অনেক সময় হাদিসের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল ঢুকিয়েও তাকে পরীক্ষা করা হতো, যেন তিনি ভুলগুলো ধরিয়ে দিয়ে নিজের মেধাযোগ্যতা প্রমাণ করেন। আর এই গোটা বিষয়টিকে শাস্ত্রীয় ভাষায় বলা হয় 'যবতুর রুওয়াত' (ضبط الرواة) বা বর্ণনাকারীদের আয়ত্তশক্তি।

বর্ণনাকারীদের জীবনচরিত দ্বারা ভরপুর ইসলামি লাইব্রেরিসমূহ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সেসব গ্রন্থে হাদিসবিশারদ ওলামায়ে কেরাম বর্ণনাকারীদের নিম্নোক্ত বিষয়াবলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন—তাদের জীবনী, তাদের শিক্ষকবৃন্দের

পরিচয়, তাদের ছাত্রদের পরিচয়, তাদের থেকে বর্ণিত হাদিসের পরিমাণ, হাদিসের তালাশে তাদের ভ্রমণ ও সেই ভ্রমণের দিন-তারিখ, সেসব ভ্রমণের মধ্যে কোন কোন মুহাদ্দিস থেকে তারা হাদিস গ্রহণ করেছেন, যে-সকল মুহাদ্দিস থেকে হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে তাদের থেকে কি বয়সের কারণে তাদের মেধাশক্তি লোপ পাওয়ার পরে বর্ণনা করা হয়েছে, নাকি পূর্বে ইত্যাদি।

উল্লিখিত বিষয়সমূহ এমন সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, গোটা ইতিহাস যার সামনে হতভম্ব। বস্তুত এ ছিল একইসাথে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস সংরক্ষণের অনন্য পন্থা, পাশাপাশি মানবজাতির নিকটও অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য এক উপায়।

হাদিস সংরক্ষণের কিছু বিস্ময়কর নীতি

হাদিস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ কতটা যত্নশীল ও দায়িত্বসচেতন ছিল, পাঠকের সামনে সামগ্রিক একটি চিত্র উপস্থাপনের লক্ষ্যে আমরা অল্প কিছু উদাহরণ পেশ করছি। যথা—

১. কেউ যদি জীবনে একবারমাত্র আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে মিথ্যা হাদিস বলে থাকে, কিন্তু তারপরে তওবাও করে নেয়, কিন্তু দ্বীনের প্রতি সতর্কতাস্বরূপ তার হাদিস আর কখনো গ্রহণ করা হবে না। যেমন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যে ব্যক্তি জীবনে একবারমাত্র হাদিসের নামে মিথ্যা বলেছে এরপর তওবা করে নিয়েছে, তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কী? তিনি বললেন, তার থেকে আজীবনের জন্য হাদিস লিপিবদ্ধ করা পরিত্যাগ করা হবে![২]

২. আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক সাহাবি বিশ্বাসহীনতার কারণে নয়, বরং শুধু ভুল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় হাদিস বর্ণনা থেকে বিরত থাকতেন। সুতরাং, সেই তারাই যখন নবিজির বাণী হিসেবে কোনোকিছু বর্ণনা করবেন, তখন কি তা এটাই প্রমাণ করে না যে, এই বর্ণনার ব্যাপারে তিনি সুনিশ্চিত ও দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী!

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর তার পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তো আপনাকে অমুক-অমুকের ন্যায় আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস বর্ণনা করতে শুনি না; এমনটি কেন? যুবাইর রা. উত্তর দেন, আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গ থেকে দূরে ছিলাম, তা নয়; কিন্তু

---

২. *আল-জারহ ওয়াত-তাদিল লি-ইবনুল মাদানি*, ৯৯।

আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ওপর মিথ্যারোপ করে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।[৩]

৩. সাহাবায়ে কেরাম হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে নবিজির বলা হুবহু শব্দ-বাক্য বর্ণনার বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকতেন। তারা নবিজির শব্দ-বাক্যকে ভাবার্থ দিয়ে পরিবর্তন করতে চাইতেন না, যদিও অর্থ একই থাকত। তাই বিভিন্ন সময় সাহাবিগণ হাদিস বর্ণনার পর সতর্কতাস্বরূপ কিছু মন্তব্য জুড়ে দিচ্ছেন দেখা যায়। যেমন, ইবনে মাসউদ রা. একটি হাদিস বর্ণনা করেন, তারপর বলেন,

(নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটি বলেছেন) অথবা এর কাছাকাছি কিছু বলেছেন, অথবা এরকমই কিছু বলেছেন, কিংবা এর সদৃশ কিছু বলেছেন।[৪]

আবু দারদা রা. যখন হাদিস বর্ণনা শেষ করতেন, তখন বলতেন,

(নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটা বর্ণনা করেছেন, বা অনুরূপ কিছু বর্ণনা করেছেন, অথবা এরই মতো কিছু একটা বর্ণনা করেছেন।[৫]

৪. ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা কাছের কেউ হলেও হাদিসবিশারদগণের নিকট হাদিসচর্চার ক্ষেত্রে কারও জন্য কোনো ছাড় ও পক্ষপাতিত্ব ছিল না। যেমন আলি ইবনে মাদিনি রহ.-এর কাছে তার পিতার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তার হাদিস কি গ্রহণ করা যাবে? তিনি প্রথমে পিতামাতার প্রতি অসদাচরণ হওয়ার ভয়ে উত্তর দিলেন না। কিন্তু প্রশ্নকারীরা যখন পীড়াপীড়ি করল, তখন শেষপর্যায়ে তিনি বললেন, 'এটা দ্বীনের ব্যাপার (তাই লুকোছুপি করার কোনো সুযোগ নেই); শোনো, আমার পিতা হাদিসের ক্ষেত্রে জয়িফ (দুর্বল)।' অবশ্য কতক আলেম তার পিতাকে 'হাসান' স্তরের বর্ণনাকারী বলে গণ্য করেছেন।[৬] তদ্রূপ ঘটনা বর্ণিত আছে *সুনানে আবু দাউদ* গ্রন্থপ্রণেতা আবু দাউদ সিজিসতানি রহ. সম্পর্কেও। তিনি নিজের পুত্র আবদুল্লাহর ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেন, 'সে হচ্ছে "কাজ্জাব" (চরম মিথ্যাবাদী)!' যদিও বাস্তবে তার ছেলে আবদুল্লাহ আহলে ইলমগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজের কাছে হক মনে হওয়া মন্তব্য প্রকাশে

---

৩. *সহিহ বুখারি*, (১০৭)।
৪. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, (২৩)।
৫. *মাজমাউজ যাওয়ায়েদ*, ১/১৮৮।
৬. *তাহজিবুত তাহজিব*, ৩/৪৩৮।

পিছপা হননি![৭] বস্তুত হাদিসবিশারদ ওলামায়ে কেরামের ব্যাপারে এ ধরনের আরও অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়।

৫. হাদিসবিশারদগণের নীতি ছিল, যে বর্ণনাকারীর ব্যাপারে বিগত মুহাদ্দিসগণের কোনো 'তাওসিক' বা 'তাদয়িফ' (অর্থাৎ, নির্ভরযোগ্যতা বা দুর্বলতার মন্তব্য) পাওয়া যাবে না, দ্বীনের প্রতি সতর্কতাস্বরূপ তাদের বর্ণনা গ্রহণ করা হবে না। পরিভাষায় বর্ণনাকারীদের এই অবস্থাকে 'জাহালাতুল হাল' (অর্থাৎ, ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে অনবগতি) বলা হয়।

৬. যে ব্যক্তি শুধু ব্যক্তিগত জীবনে মিথ্যা বলে, তার হাদিসও গ্রহণ করা হয় না। কেননা, তার মিথ্যার অভ্যাস আছে বিধায় অমূলক নয় যে, সে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামেও মিথ্যাচারের দুঃসাহস করতে পারে। এমনকি ইমাম বুখারি রহ. তো এমন ব্যক্তি থেকেও হাদিস নিতে বিরত থেকেছেন, যিনি নিজের চতুষ্পদ জন্তুকে মিথ্যা লোভ দেখিয়েছেন মাত্র!

৭. বর্ণনাকারীগণ যখন হাদিসের কোনো শব্দ বা বাক্যের ক্ষেত্রে সন্দেহে পড়তেন, তখন তারা উক্ত সন্দেহের কথা উল্লেখ করে দিতেন, যদিও সন্দেহকৃত দুটো শব্দ-বাক্যের অর্থ একই হতো। যেমন, এক হাদিসে এসেছে যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলি রা.-এর জন্য সুস্থতার দোয়া করেছেন। কিন্তু হাদিসটির বর্ণনাকারী শুবা রহ. সন্দেহে পড়ে যান যে, নবিজি দোয়ার ক্ষেত্রে কোন শব্দটি ব্যবহার করেছেন—اَللّٰهُمَّ اشْفِهِ (হে আল্লাহ, তাকে সুস্থ করে দিন), নাকি اَللّٰهُمَّ عَافِهِ—(হে আল্লাহ, তাকে সুস্থ করে দিন)।[৮] তাই ইমাম আহমাদ রহ. তার গ্রন্থে উভয় শব্দ উল্লেখ করে বলেন, হাদিসের বর্ণনাকারী শুবা ঠিক কোন শব্দটি বর্ণিত হয়েছে, তা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন।

এরূপভাবে ইমাম মুসলিম রহ. 'কেয়ামতের দিন মানুষের ঘামের কারণে তাদের মুখে লাগাম লেগে যাওয়া'-সংক্রান্ত হাদিস বর্ণনা করেছেন। যেখানে এসেছে, 'কেয়ামতের দিন ঘাম **মানুষের মুখ অথবা তাদের কান** (إلى أفواه الناس، أو إلى آذانهم) পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।' হাদিসটি বর্ণনার পর ইমাম মুসলিম বলেন,

---

৭. *দিয়াজ আলামিন নুবালা*, ১০/৫৮০।

৮. *মুসনাদে আহমাদ*, ১/২২৮ (৮৪১)।

'সাওর নামক বর্ণনাকারীর সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে যে, তার ওস্তাদ **মানুষের মুখ** শব্দ বলেছেন, নাকি **তাদের কান।**'[৯]

ভেবে দেখুন, এখানে এমন কী গুরুতর পার্থক্য আছে যে, এত গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে! কিন্তু প্রকৃত বিষয় হচ্ছে দ্বীন সংরক্ষণ ও আমানত হেফাজতের দায়িত্ববোধ। হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে এমন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পার্থক্য, যার ফলে অর্থের মধ্যে তেমন একটা প্রভাব পড়ে না, সেগুলোর প্রতিও এরকম পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন সকলকে হতভম্ব করেছে! তদ্রূপ আনাস রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদিসের প্রতি লক্ষ করুন। তিনি বলেন, আমি দশ বছর যাবৎ আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত করেছি। **আল্লাহর কসম**, এ দীর্ঘ সময়ের মাঝে তিনি একবারের জন্যও আমার প্রতি 'উফ' শব্দটি বলেননি! অথবা আমার করা কোনো কাজের কারণে বলেননি, 'তুমি এটা করতে গেলে কেন!'

ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনার পর বলেন, আবু রবি নামক বর্ণনাকারী তার বর্ণনায় **'আল্লাহর কসম'** শব্দটি উল্লেখ করেননি।[১০]

৮. হাদিস সংরক্ষণের ইতিহাসে আরেক অভূতপূর্ব চিত্র হচ্ছে, কতক হাদিস বর্ণনাকারী মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে নিজেদের হাদিসের পাণ্ডুলিপি মাটিতে দাফন করে দেওয়া, অথবা এ ব্যাপারে অসিয়ত করে যাওয়ার ঘটনা। এসব পাণ্ডুলিপিতে তারা সারাজীবন যেসব হাদিস লিপিবদ্ধ করেছেন, অথবা অন্যদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সেগুলো সংরক্ষিত থাকত। কিন্তু এমন গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপির প্রতি তাদের এরকম আশ্চর্য সিদ্ধান্তগ্রহণের পেছনে একমাত্র কারণ ছিল দ্বীনের প্রতি আশঙ্কাবোধ। মৃত্যুর পরে হয়তো তাদের এসব পাণ্ডুলিপি অবিশ্বস্ত কারও হাতে পড়বে, যে এসবের বরাতে তাদের নামে মিথ্যা হাদিস বর্ণনা শুরু করবে। উদাহরণত, পাণ্ডুলিপি দাফনকারী একজন মনীষীর মাঝে রয়েছেন ইমাম বুখারি রহ.-এর শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনে আলা আবু কুরাইব রহ.।[১১]

৯. হাদিসবিশারদ ওলামায়ে কেরাম বর্ণনা গ্রহণের ক্ষেত্রে কেবল বর্ণনাকারীদের সততা ও একাগ্র ইবাদত-বন্দেগির ব্যাপারই বিবেচনা করেননি; বরং তাদের স্মৃতিশক্তি ও বর্ণনা সংরক্ষণক্ষমতা দুর্বল নাকি শক্তিশালী, সেটাও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে আবু যিনাদ রহ.-এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে

৯. *সহিহ মুসলিম*, (২৮৬৩)।
১০. *সহিহ মুসলিম*, (২৩০৯)।
১১. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৯/৫৭২।

যে, আমি মদিনায় একশজন হাদিস বর্ণনাকারীর সাক্ষাৎ পেয়েছি, তারা প্রত্যেকেই ছিলেন সততার ক্ষেত্রে নিরাপদ (বর্ণনার ক্ষেত্রে মিথ্যা বলার শঙ্কা ছিল না); এতৎসত্ত্বেও তাদের থেকে হাদিস গ্রহণ করা যাবে না।[১১]

বিপরীত চিত্র হিসেবে মুহাম্মাদ ইবনে সায়েব কালবি ছিলেন বহু রচনাকার্য সম্পাদনকারী আলেম। একশ পঞ্চাশটির মতো গ্রন্থ প্রস্তুত করেছিলেন তিনি। কিন্তু ওলামায়ে কেরাম তার কোনো বর্ণনার ওপরই গুরুত্ব দেননি, আর না তার গ্রন্থাবলির ওপর নির্ভর করেছেন। কারণ, সততার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনিরাপদ।[১২]

১০. হাদিসবিশারদ ওলামায়ে কেরাম বর্ণনাকারীদের সনদগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ করতেন, এবং যাদের সূত্রে তারা বর্ণনা করছেন, তাদের ক্ষেত্রে এই বর্ণনাকারীদের অবস্থা লক্ষ করতেন। তারপর তারা সেসব হাদিস কারও সাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য বলতেন, এবং অন্য কারও সাপেক্ষে অগ্রহণযোগ্য। এর পেছনে বিভিন্ন সূক্ষ্ম কারণ থাকত। যেমন, কেউ হয়তো এক ওস্তাদের হাদিস ভালোভাবে আয়ত্ত ও লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু অন্য ওস্তাদের হাদিসের ক্ষেত্রে পূর্বের ন্যায় সক্ষম হননি। অথবা অনেক বর্ণনাকারী যুবক বয়সে স্মৃতিশক্তির যতটা নিপুণতা দেখাতে পারেন, বয়স বেড়ে গেলে তা পারেন না। আবার এক অঞ্চলে হাদিস বর্ণনার সময় কারও কাছে হয়তো বর্ণিত হাদিসগুলোর পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান ছিল, যে কারণে কোনো সংশয় হলে তিনি সেখানে চোখ বুলিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিতে পারতেন, পক্ষান্তরে অন্য অঞ্চলে অবস্থানকালে তার কাছে হাদিসের পাণ্ডুলিপিটি ছিল না, যে কারণে তার পুরোপুরি স্মৃতিশক্তির ওপরই নির্ভর করতে হতো, আর তাই কখনো কখনো তার ভুল হয়ে যেত। সুতরাং, এরূপ সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলোও হাদিসবিশারদগণ চিহ্নিত করে চূড়ান্ত সচেতনতা দেখিয়েছেন। উদাহরণত—

- মুহাম্মাদ ইবনে আজলান মাদানি। আবু হুরাইরা রা. থেকে তিনি যে-সকল হাদিস বর্ণনা করেন, সেগুলো গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, এ ক্ষেত্রে তার 'ইখতেলাত' হয়ে যেত (অর্থাৎ, বয়স বা অন্য কোনো সমস্যার কারণে তালগোল পেকে যেত)।

---

১১. *তাওজিহুন নজর লিল-জাযায়িরি*, ২৫।
১২. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৪/৪২৪।

- আবদুর রাজ্জাক নামক বর্ণনাকারী মক্কায় অবস্থানকালে সুফিয়ান সাওরি থেকে যে-সকল হাদিস বর্ণনা করেছেন, সেগুলো 'মুজতারিব' (অর্থাৎ, বর্ণনায় বেশ গোলযোগ বেধে যেত)।
- আবু মুআবিয়া দরির নামক বর্ণনাকারী আমাশ থেকে যেসব হাদিস বর্ণনা করেন, সেগুলো গ্রহণযোগ্য। তবে অন্যদের সূত্রে বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি কখনো 'ওয়াহম' বা ভ্রমের শিকার হতেন।
- হুমাইদ তবিল নামক বর্ণনাকারী আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে কেবল ১৪টি হাদিস শুনেছেন। তার থেকে আর কোনো হাদিস তিনি সরাসরি শোনেননি। এরপর হাদিসবিশারদগণ সেই ১৪টি হাদিসও একে একে উল্লেখ করে দিয়েছেন।
- ইসমাইল ইবনে আইয়াশ নামক বর্ণনাকারী যখন হেজাজবাসী থেকে কোনো হাদিস বর্ণনা করেন, সে ক্ষেত্রে তিনি দুর্বল; পক্ষান্তরে তিনি যখন শামবাসী থেকে বর্ণনা করেন, তখন তিনি নির্ভরযোগ্য।
- শরিক নাখায়ি নামক বর্ণনাকারী ৪০০টি হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে ভুল করেছেন। এবং সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা নামক বর্ণনাকারী যুহরির সূত্রে ২০টি হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে ভুল করেছেন।[১৪]

১১. ইসলাম গিবত নিষিদ্ধকরণে অত্যন্ত কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে। এতৎসত্ত্বেও দ্বীনকে হেফাজত ও নিষ্কলুষ রাখার খাতিরে হাদিস বর্ণনাকারীদের ভালো-মন্দ ও দোষত্রুটি বর্ণনার অনুমতি দিয়েছে।[১৫]

১২. অনেক হাদিস বর্ণনাকারী ছিলেন মূলত সর্ববিবেচনায় সিকাহ্ বা নির্ভরযোগ্য। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির ফলে অথবা কোনো ধরনের মুসিবতের শিকার হয়ে একসময় তাদের স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, যে কারণে তারা হাদিস বর্ণনার সময় ইখতেলাত বা তালগোল পাকিয়ে ফেলার শিকার হন। এমন বর্ণনাকারীদের মাঝে আছেন আতা ইবনে সায়েব, আবু ইসহাক সাবিয়ি, আবদুর রাজ্জাক সানআনি প্রমুখ। অতএব, উল্লিখিত প্রকারের ব্যক্তিবর্গ থেকে যে-সকল ছাত্র তাদের ইখতেলাতের পূর্বে হাদিস সংগ্রহ করেছেন বলে জানা যাবে, সেসব

---

[১৪]. দ্রষ্টব্য : *আন-নাসখুল নাসিখ মিন-নাসখানি*, ৪৪; *আত-তানবীহ ফি-মান ইহতামালাতহু কুতুবুহু মিনাল মুহাদ্দিসিন লি-ইবনি রজব* (পুস্তিকা দুটি *মাজমুউ রাসায়িলি হাদিসিয়্যাতি ফিল জারহি ওয়াত-তা'দিল* শীর্ষক সংকলনের অধীনে প্রকাশিত হয়েছে)।

[১৫]. *ইলমুল জারহি ওয়াত-তা'দিল লি-ইউসুফ মারআশলি*, ৫৭।

হাদিস গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে যারা তাদের থেকে ইখতেলাতের পরে হাদিস সংগ্রহ করেছেন বলে জানা যাবে অথবা আগে-পরে কখন সংগ্রহ করেছেন সেই সময়টি জানা যাবে না, তাদের হাদিস গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন, ইবনে রজব হাম্বলি রহ. এমন ১৩ জন হাদিস বর্ণনাকারী আলেমের নাম উল্লেখ করেছেন, যাদের হাদিস সংগ্রহের পাণ্ডুলিপিগুলো পুড়ে গিয়েছিল। ফলে তারা নিজেদের স্মৃতিশক্তি থেকে বর্ণনা শুরু করেন এবং ভুল করতে থাকেন। যেমন তাদের মধ্যে রয়েছেন, হাম্মাম ইবনে ইয়াহয়া, শারিক নাখায়ি, হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান প্রমুখ।[১৬]

১৩. হাদিসবিশারদ ওলামায়ে কেরাম বর্ণনাকারীদের এমনসব গুণ তালাশেও আগ্রহী ছিলেন, যেগুলোর মূলত হাদিসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতার সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না; বরং উদ্দেশ্য ছিল কেবল তাদের ব্যাপারে আরও বেশি বিশ্বস্ততা ও নিশ্চয়তা অর্জন। যেমন, ইয়াকুব ইবনে শাইবা রহ. ইবনুল মাদিনি রহ.-কে জিজ্ঞেস করেন, কথিত আছে যে, হাসান ৭০ জন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবি থেকে হাদিস সংগ্রহ করেছেন। ইবনুল মাদিনি উত্তরে বলেন, অমূলক কথা এটি। আমি নিজে সে সকল বদরি সাহাবির সংখ্যা গণনা করেছি, কিন্তু সেই সংখ্যা ৫০-এও পৌঁছেনি। তাদের মধ্যে ২৪ জন রয়েছেন মুহাজির সাহাবি।[১৭]

---

১৬. আত-তাবয়িন ফি-মান ইহতারাকাত কুতুবুহু মিনাল মুহাদ্দিসিন ফি-ইলালি মাজালা।
১৭. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৫/৪৫৯।

ভূমিকা : ২

নবিগণের মুজেজা ও জাদুকর-গণকদের ভেলকিবাজির মাঝে পার্থক্য

বস্তুত নবুয়ত ও রিসালাত আল্লাহর পক্ষ থেকে সবচেয়ে মর্যাদার আসন। তাই অনেক মানুষ এ আসনে উপবিষ্ট হতে নবুয়তের মিথ্যা দাবি করে থাকে। তাই প্রশ্ন হলো, কী করে আমরা প্রকৃত নবি ও মিথ্যা নবুয়তের দাবিদারকে পার্থক্য করতে সক্ষম হব?

এর উত্তর হচ্ছে, একজন সত্য নবির সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক অনেক প্রমাণ ও মুজেজা থাকে, পক্ষান্তরে কোনো মিথ্যাবাদীর সাথে সেসব প্রমাণ থাকে না; তাই এদের মিথ্যাচার হয়ে থাকে সুস্পষ্ট। সুতরাং, একজন নবির সাথে একটি (মিথ্যা নবুয়তের দাবিকারী) জাদুকরের পার্থক্য সেরূপ, 'একজন ফেরেশতার সাথে একটি শয়তানের পার্থক্য যেরূপ, জান্নাতির সাথে জাহান্নামির পার্থক্য যেরূপ, এবং সর্বোত্তম মানুষের সাথে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিটির পার্থক্য যেরূপ!'[১৮]

দ্বীনে ইসলাম যেহেতু বিশ্বপ্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত দ্বীন এবং তিনিই একে দ্বীন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সুস্পষ্ট সত্যরূপে আমাদের নিকট পাঠিয়েছেন, তাই কল্পনা করা যায় না যে, তিনি তাঁর প্রেরিত নবির সত্যবাদিতা ও ভণ্ড নবিদের মিথ্যাচার স্পষ্ট করার জন্য পার্থক্য নির্ণায়ক কোনো মানদণ্ড প্রকাশ করবেন না, যার মাধ্যমে সত্য নবুয়ত মিথ্যার সাথে মিশ্রিত হয়ে পড়া থেকে রক্ষা পাবে। এজন্যই কানা দাজ্জালের ভেলকিবাজি ও অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ডের সাথে এমন অনেক বিষয়ও প্রকাশ পাবে, যা মানুষের সামনে তার মিথ্যাবাদিতা সুস্পষ্ট করে দেবে। যেমন—

- দাজ্জাল নিজের জন্য প্রভুত্ব দাবি করবে। অথচ তার ন্যায় দেহধারী একটি সত্তা, উপরন্তু তা অন্ধ ও ত্রুটির শিকার, এমন কেউ কস্মিনকালেও প্রভু হতে পারে না! তাই স্পষ্টভাবেই বোঝা যাবে যে, তার দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা।
- তার কপালে লেখা থাকবে 'কাফের', যা প্রতিটি মুমিনই পড়তে সক্ষম হবে।

---

১৮. *আন-নুবুওয়াত ফি-ইবনি তাইমীয়া*, ৪১২।

- সকল নবিই তাদের উম্মতকে দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক করে গেছেন। তার নাম, বৈশিষ্ট্য প্রতিটি বিষয়ই এত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তাকে চেনার মাঝে কোনো অস্পষ্টতা বাকি ছিল না![১৯]

নিম্নে নবিগণের অলৌকিকতা ও ভণ্ডদের ভেলকিবাজির কিছু পার্থক্য বর্ণনা করা হলো—

এক. মিথ্যা নবুয়তের জালিয়াতি ফাঁস হয়ে যায়

এমন কোনো মিথ্যা নবুয়ত দাবিকারী নেই, যাকে আল্লাহ অপমানিত লাঞ্ছিত করে তার মিথ্যা উন্মোচন করে দেননি, তার ভবিষ্যদবাণীসমূহ মিথ্যা প্রমাণ করেননি, তার বাহিনীকে পরাজিত করেননি! এই যে দেখুন মুসাইলিমাতুল কাজ্জাব, তার চোখের সামনেই তার দুর্ভাগ্য প্রকাশিত হয়েছে। সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই শর্তে নবি মেনে নিতে রাজি ছিল যে, তাঁর পরে তাকে নবুয়তের অধিকার দিতে হবে! বলুন দেখি, এটা আবার কেমন নবি! তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সরাসরি হত্যার সংবাদ দিয়ে বলেছিলেন যে, তুমি যদি (দ্বীন ও আমার আনুগত্য থেকে) পিছু হটো, তবে আল্লাহ তোমায় ধ্বংস করে দেবেন![২০]

এভাবেই উদয় হয়েছিল আসওয়াদ আনসির। কিন্তু সেও তার মিথ্যাচারসহ নিহত হয়। নবুয়তের ময়দান দখল করতে এসেছিল তুলাইহা আসাদি। সে তার সেনাবাহিনীকে বিজয়ের সুসংবাদও দিয়েছিল বটে, কিন্তু তার সুসংবাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আল্লাহ তাকে মুসলমানদের হাতে পরাজিত করেন। এরপর সে নিজেই সত্য নবির অনুসরণে ইসলাম গ্রহণ করে নেয় এবং মুসলিম মুজাহিদ হিসেবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারপর ধীরে ধীরে তার ইসলামে নিষ্ঠা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

নববি যুগে আর যে-সকল গণক ও জাদুকরের উপস্থিতি ছিল, তারা অবশ্য কেউ নবুয়তের দাবি করেনি। বস্তুত এ প্রকারের লোকেরা নিজেদের চর্চা ও শিক্ষার মাধ্যমে যা আয়ত্ত করে, মানুষের সামনে সেগুলোরই প্রকাশ ঘটায়, এসবের সাথে ওহি ও মুজেজার কোনো সম্পর্ক নেই, এবং সেসব অবশেষে ভেলকি ও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়।

---

১৯. *ফাতহুল বারি শি-ইবনি হাজার*, ১৩/১১৩।

২০. *সহিহ বুখারি*, (৩৬২৩); *সহিহ মুসলিম*, (২২৭৩)।

দুই. সত্য নবি ও মিথ্যা নবি দাবিকারীর গুণ-বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য

সত্য নবিগণ হন সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ, একত্ববাদী, সৎ মানুষ। তারা সত্যচর্চায় কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করেন না। পক্ষান্তরে জাদুকর ও গণকশ্রেণি হয় নিরেট মিথ্যাবাদী ও ধোঁকাবাজ। এদের মধ্যে শিরক, কুফর, পাপাচার, ধর্মহীনতা ও অসৎকর্মে জড়ানোর সমারোহ দেখা যায়।

তিন. অলৌকিক কর্মকাণ্ড প্রদর্শনের সক্ষমতায় পার্থক্য

নবিগণের মুজেজা বা অলৌকিক কর্মকাণ্ড কখনো অন্য কেউ দেখাতে সক্ষম হয় না। পক্ষান্তরে জাদুকর ও গণকদের অলৌকিক কর্মকাণ্ড সে স্তরে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। যেমন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ন্যায় কোনো জাদুকর কখনো চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করতে সক্ষম হবে কি?! মুসা আলাইহিস সালামের ন্যায় তারা কখনো নদের মাঝে শুকনো পথ উন্মোচন করতে পারবে কি?! তাদের মাঝে এমন কাউকে পাওয়া যাবে কি, যে দুইশ বা পাঁচশ বছর পরের কোনো ভবিষ্যৎ ঘটনার এমন সূক্ষ্ম চিত্রাঙ্কন করবে যে, সে সময় হুবহু তার কথার বাস্তবতা পরিলক্ষিত হবে?! বিপরীতে এদের অধিকাংশ ভবিষ্যদবাণীর চিত্র হচ্ছে, ব্যাপকভাবে কিছু একটা বলে দেওয়া। যেমন, অমুক সময় বিরাট এক ঘটনা ঘটবে, এক মহাপুরুষের প্রয়াণ ঘটবে ইত্যাদি। বস্তুত এ ধরনের ভবিষ্যদবাণীর জন্য গণকবৃত্তির প্রয়োজন পড়ে না, প্রতিটি সময়েই এমন কিছু ঘটে চলে।

চার. উৎসকেন্দ্রিক পার্থক্য

মুজেজা কারও থেকে শিক্ষালাভ করা যায় না, কোনো প্রতিষ্ঠান কাউকে তা দীক্ষাদানের ক্ষমতা রাখে না। এটি নিছক আল্লাহর দান ও তাঁর পক্ষ থেকে সম্মানস্বরূপ। সুতরাং, নবিগণ মুজেজাপ্রাপ্ত হন কোনো পূর্বপ্রতিশ্রুতি ছাড়া আকস্মিকভাবে। পক্ষান্তরে জাদুকর ও গণকদের অলৌকিক বিষয়াবলি প্রদর্শনের কৌশল কারও না কারও থেকে শিখতে হয়, কোনো প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হতে হয়।

পাঁচ. চ্যালেঞ্জহীনতার পার্থক্য

মুজেজার চ্যালেঞ্জ কেউ খণ্ডন করতে পারে না। কেননা, মুজেজা মানেই সকলকে উক্ত কাজ প্রদর্শনে অক্ষম করে দিয়ে নবির সত্যতা প্রমাণ করা। আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কার কাফেরদের বললেন, আমার নবুয়তের প্রমাণ হচ্ছে আমি চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করে দেখাব, যা আল্লাহর নবি ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না। তখন তাঁর এ চ্যালেঞ্জ সত্য প্রমাণিত হওয়ার জন্য আবশ্যক হচ্ছে, অন্য কেউ এটা খণ্ডন করতে না পারা। পক্ষান্তরে কোনো

মুশরিক যদি বলে বসত, আমিও চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করব, আর সে তা করেও দেখাত, তবে নবিজির এ কর্ম আর মুজেজার মাহাত্ম্য বহন করত না। কেননা, এটা তো কেবল তাঁর একার কারিশমা নয়, বরং অন্যরাও এতে সক্ষম! এজন্যই তিনি যখন তাঁর চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করলেন, তখন তাঁর বিরোধিতাকারী কাউকে পাওয়া যায়নি। তদ্রূপ কুরআনও তাদের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে, কিন্তু কেউ সেগুলোর বিরোধিতা করার সাহস পায়নি; নবিজির আঙুল থেকে পানির ফোয়ারা বয়ে গেছে, কিন্তু কেউ এর খণ্ডন করে দেখাতে পারেনি।

পক্ষান্তরে জাদুকর ও গণকদের কর্মকাণ্ডকে চ্যালেঞ্জ জানানো যায়। একদলের অলৌকিকতাকে অন্যদল ঠিকই তাদের নিকট লৌকিক প্রমাণ করে দিতে সক্ষম। তাই ফেরাউন যখন মুসা আলাইহিস সালামকে জাদুকর ধারণা করল, তখন সে অন্য জাদুকরদের সূত্রে তাকে চ্যালেঞ্জ জানাল। কিন্তু তার ধারণা মিথ্যা প্রমাণ করে হজরত মুসার মুজেজা জাদুকরদের জাদুকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নিল। ফলে জাদুকররা ঠিকই বুঝতে পারে, এ কোনো জাদু নয়। তাই তারা অনতিবিলম্বে হজরত মুসা ও হারুনের রবের প্রতি ইমান আনে।

ছয়. বাস্তবতার পার্থক্য

এক স্থান থেকে অন্য স্থানে দ্রুত স্থানান্তরিত হওয়া নবিগণের মুজেজা হতে পারে না। কারণ, এ ধরনের কাজ মানুষের জন্য সম্ভব না হলেও অন্য অনেক প্রাণীর পক্ষেই সম্ভব। ওরা খুবই দ্রুত স্থানান্তরিত হয়ে দেখাতে পারে। তদ্রূপ আকাশে ওড়াও কোনো মুজেজার অন্তর্ভুক্ত নয়, কেননা পাখির পক্ষে এটি সম্ভব। কিন্তু হাতের আঙুল থেকে পানি বইয়ে দেখানো, এটি নিশ্চিত মুজেজা, যা আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করে দেখিয়েছেন। বলুন, আছে কি এমন কোনো জাদুকর বা গণক, যে এটা করে দেখাবে?! তদ্রূপ কুরআনও এক চিরন্তন মুজেজা; কেউ কি একে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এর মতো আরেকটি গ্রন্থ এনে দেখাতে পারবে?!

সাত. প্রকার-সংখ্যার পার্থক্য

তর্কের খাতিরে বলতে গেলে, জাদুকর ও গণকরাও দুয়েকটি অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে বটে; যেমন, নিকট ভবিষ্যতের কোনো সংবাদ দেওয়া এবং তার কিয়দংশ বাস্তবে পরিণত হওয়া, যদিও তার অধিকাংশটুকুই ভুল প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে মুজেজা হচ্ছে এমন বিষয়, যা ত্রিশ প্রকারেরও অধিক এবং প্রতিটিই সত্য ও বাস্তবতার সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ, জাদু ও গণকবৃত্তি হচ্ছে বিশাল সীমানায়

আন্দাজের ওপর ঢিল ছুড়ে অল্প কিছু হাসিল করে নেওয়া, পক্ষান্তরে নবুয়ত হচ্ছে সত্যের প্রত্যক্ষদর্শন ও গোটা বাস্তবতার লক্ষ্যভেদ!

আট. আদেশ-নিষেধের পার্থক্য

নবিগণ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করে থাকেন। পক্ষান্তরে মন্দ লোকেরা অসৎকাজের আদেশ ও সৎকাজে নিষেধ করে থাকে। নবিগণ মানুষের দ্বীন-দুনিয়ার জন্য কল্যাণকর নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তাদের তাওহিদ ও ইখলাসের সাথে আমলের আদেশ করে থাকেন। নিষেধ করে থাকেন সর্বপ্রকার শিরক, মিথ্যা ও জুলুম-অত্যাচার থেকে। তাই এই মহামানবগণের কর্মধারা বিবেক ও মানবীয় স্বভাবধর্মের নিকট সাযুজ্যপূর্ণ বলে মনে হয়। ফলে মানুষের বোধবুদ্ধি তাদের সত্যবাদী বলে মেনে নেয়। মোটকথা, প্রতিজন নবিই মানুষকে এমন বিষয়সমূহের আদেশ করেন, যেসবের আদেশ তাঁর পূর্বেকার নবিগণও করেছেন। তাই এ সকল নির্দেশ মানুষের নিকট সুপরিচিত হয়ে থাকে।

নয়. পরিবার ও পরিচয়ের পার্থক্য

নবিগণ একই বাগানের বিভিন্ন ফুলমাত্র। একই পরিবারের বিভিন্ন সদস্য। যেন একই পিতার ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীর সন্তান। তাই তারা একে অপরকে ভালোবাসেন, পছন্দ করেন, অপরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, সকলে সকলের রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন। পক্ষান্তরে জাদুকর ও গণকশ্রেণি নিকৃষ্ট জ্ঞাতিত্ব ও পরিবারের সদস্য হয়ে থাকে, তারা একে অপরের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে।

দশ. নবিগণ সত্য সংবাদ দেন, মন্দ লোকেরা মিথ্যা সংবাদ দেয়

নবি-রাসুলগণ যেসব অদৃশ্য সংবাদ ও তথ্য দিয়ে থাকেন, সেগুলো নিশ্চিত সত্য। পক্ষান্তরে জাদুকর, গণক, মুশরিক, আহলে কিতাব ও বেদাতি লোকেরা যেসব অদৃশ্য খবরাখবর দিয়ে থাকে, সেগুলোর মধ্যে নিশ্চিত মিথ্যার সন্নিবেশ থাকে।

এগারো. মুজেজা একটি শরিয়ত ও জীবনব্যবস্থার দিকে আহ্বান করে

মুজেজা প্রদর্শনের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা ও বিধিবদ্ধ আইন অনুসরণের প্রতি আহ্বান জানানো। পক্ষান্তরে জাদু ও ভেলকিবাজির পেছনে এ ধরনের কোনো মহৎ লক্ষ্য থাকে না।[৬১]

---

৬১. মুজেজা ও জাদু নিয়ে আলোচিত এখানকার অধিকাংশ পার্থক্য ইবনে তাইমিয়া রহ. তার *জাম-নুবুওয়াত* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। বিশেষত ৩৮৮-৪২২ নম্বর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বারো. মুজেজা প্রকৃতপক্ষেই অলৌকিক

মুজেজা কোনো ভেলকিবাজি নয়, বরং বাস্তবেই অতিপ্রাকৃত। এটা প্রকৃতপক্ষেই সকল স্বাভাবিক নিয়মনীতির বলয় ভেঙে দিয়ে প্রদর্শিত হয়। পক্ষান্তরে জাদুকর ও গণকশ্রেণির অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ড শুধু অসাধারণমাত্র, অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক নয়।

তেরো. মুজেজা শাস্ত্রীয় দক্ষ ব্যক্তিদের চ্যালেঞ্জ জানায়

যে বিষয়ে মুজেজা প্রদর্শিত হয়, সে শাস্ত্রের দক্ষ ব্যক্তিদের এর মাধ্যমে অক্ষম সাব্যস্ত করা হয়। পক্ষান্তরে জাদু ও ভেলকিবাজির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে তাক লাগিয়ে দেওয়া গেলেও, সে শাস্ত্রে দক্ষ ব্যক্তিদের নিকট সেটা কঠিন কোনো ব্যাপার নয়।[২২]

---

২২. *কাশফুল আসরার লিল-আকফাহানি*, ১৮৩ (শেষোক্ত দুটি পার্থক্য)।

ভূমিকা : ৩

সামষ্টিক প্রমাণের আলোকে ইসলামের প্রামাণিকতা

এ গ্রন্থে ইসলামের সত্যতাস্বরূপ অল্প কিছু প্রমাণ উল্লেখ করেছি। এর মধ্যে এমন কিছু প্রমাণ রয়েছে, যেগুলো একাই ভ্রান্ত ধর্মের অসারতা প্রমাণ করে ইসলামের সত্যতা প্রমাণ করতে এবং ইসলামকে সৃষ্টিজগতের চরম বাস্তবতা হিসেবে তুলে ধরতে সক্ষম। আবার এখানে এমন কিছু প্রমাণও রয়েছে, যা এককভাবে তো ইসলামের সত্যতা প্রমাণের জন্য কিংবা কারও মনে ইসলামের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করতে যথেষ্ট নয়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে একজন মানুষকে তার মনের অজান্তেই ইসলামের ঘোষণা পাঠ করাতে সক্ষম।

বস্তুত এরকম সামগ্রিক প্রমাণের উপস্থিতি দেখে অনেক মানুষ সাহাবির খাতায় নাম লেখাতে বাধ্য হয়েছিলেন। যেমন, কেউ হয়তো নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে তার বিশ্বাস অর্জনের দাবি জানিয়েছে। এরপর নবিজি যখন তার দাবি পূরণ করলেন, তখন সে ইমান গ্রহণ করে নিল। হজরত যায়েদ ইবনে আসলাম রা.-এর ঘটনা ছিল তেমন। আবার কেউ হয়তো নবিজির উত্তম আচার-আচরণ, মোহরে নবুয়ত ও এই নিষ্কলুষ দাওয়াতের স্বচ্ছ গতিপ্রকৃতি দেখে ইসলাম গ্রহণ করেছে। কেউ হয়তো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে পূর্ববর্তী আসমানি গ্রন্থাবলিতে বর্ণিত নবির গুণাবলির প্রকাশ দেখে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

সম্ভাবনা

আমরা যদি চিন্তা করি, এসব নবুয়তের প্রমাণ একটি, দুটি বা তিনটি কি কোনো মিথ্যা নবির মধ্যে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব? সে ক্ষেত্রে বলব, হ্যাঁ, একটি প্রমাণ হয়তো কারও মধ্যে প্রকাশ পেতে পারে। দুটি প্রমাণও কারও মধ্যে প্রকাশ পেতে পারে, তবে সেই সম্ভাবনা মোটামুটি দুর্বল। আর মিথ্যা নবির মধ্যে একাধারে তিনটি প্রমাণ প্রকাশ পেয়ে যাওয়া, এটা প্রকৃতপক্ষেই চূড়ান্ত পর্যায়ের দুর্বল সম্ভাবনা। এটাও ঠিক, মিথ্যা নবির মধ্যে একাধারে তিনটি নবুয়তের প্রমাণ ফুটে ওঠা শক্তিশালী বিষয়ই বটে। তবে আমাদের গ্রন্থে আলোচিত সব প্রমাণই কোনো মিথ্যা নবির মধ্যে প্রকাশ পেয়ে যাবে, বস্তুত এটা তো ঘন কাঁটাদার গাছে উঠে কাঁটা পেড়ে আনার নামান্তর! চক্ষুহীনের জন্য অবলোকন-ক্ষমতার মঞ্চায়ন! দুই মেরুর

একত্রীকরণ! অন্ধকার রাতে সূর্যের উদয়! বরং বলতে পারেন, সূর্যকে কাফন পরিয়ে সময়ের কবরে মাটিচাপা দেওয়ার নামান্তর!!

এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে হুজ্জাতুল ইসলাম গাজ্জালি রহ. বলেন, ইসলাম কখনো কোনো ব্যক্তির সামনে বহু প্রমাণের সমষ্টি হয়ে অকাট্যরূপে উপস্থিত হয় (এবং তাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগ্রহণে বাধ্য করে); তবে এগুলো যদি এককভাবে উপস্থাপিত হতো, তবে তার মনের ওয়াসওয়াসা দূর করে ইসলামের সত্যতা প্রকাশ করতে সক্ষম ছিল না। কিন্তু সেসব বিষয় যখন সমষ্টিগতভাবে তার সামনে উপস্থিত হয়, তখন আর তার মনে কোনো সংশয় বা দোদুল্যমানতা বাকি থাকে না।

এ গ্রন্থে আমি যখন কোনো বর্ণনা উল্লেখ করেছি কিংবা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুজেজা বর্ণনা করেছি, সে ক্ষেত্রে একাধিক উদাহরণ উপস্থাপনের প্রতি লক্ষ রেখেছি। যেন সুন্নতসংক্রান্ত আলোচনা হলে বর্ণনাটির বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়, আর চিন্তাধারাসংক্রান্ত আলোচনা হলে বিষয়টির ভিত মজবুত হয়। এ ক্ষেত্রে কখনো আমি প্রয়োজনমাফিক অনেক উদাহরণও উল্লেখ করেছি, যেন বিষয়টি সুসাব্যস্ত হয়ে তা এককভাবেই আমাদের গ্রন্থের শিরোনামের যথার্থতা প্রমাণ করতে পারে এবং দেখাতে পারে যে, নিশ্চয় ইসলাম সত্য ধর্ম, শ্রেষ্ঠ ধর্ম!

আমর ইবনে আস রা.-কে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি কেন দেরিতে ইসলাম গ্রহণ করলেন? তিনি উত্তর দেন, ইতিপূর্বে আমাদের প্রবীণদের কাছে কর্তৃত্ব ছিল, আমরা কেবল তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ করতাম। কিন্তু এরপর যখন আমাদের হাতে কর্তৃত্বের ছড়ি এলো, আমরা দেখতে পেলাম এর সত্যতা তো একেবারেই স্পষ্ট![২৫]

[২৫]. *মাবাহিস ফি ইজালিল কুদ্দামান লি-মুত্তকা মুসলিমিন*, ৬৮।

ভূমিকা : ৪

ইসলামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব গ্রন্থস্থ শিরোনামে সীমিত নয়

আমরা কেন মুসলমান ও ইসলামের সত্যতা কী, সে ক্ষেত্রে আমরা আল্লাহর ইচ্ছায় এ গ্রন্থে অল্প কিছু কারণ ও প্রমাণ উল্লেখ করেছি মাত্র। তবে এর অর্থ কখনো এ নয় যে, ইসলামের প্রমাণ উক্ত সংখ্যার মাঝে সীমাবদ্ধ! বরং ইসলামের সত্যতা ও অগ্রগণ্যতা প্রকাশ করতে এমন আরও শত শত কারণ ও প্রমাণ উল্লেখ করা সম্ভব, এখানে যেভাবে আল্লাহ তায়ালা আমার সামনে বেশ কিছু কারণ ও নিদর্শন স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আমি আল্লাহর কাছে কামনা করি, তিনি আমার সামনে তার দ্বীনের আরও অনেক-অনেক নিদর্শন উন্মোচন করে দিন, যার মাধ্যমে ইমানদারদের ইমান আরও বৃদ্ধি পায় ও শক্তিশালী হয়।

উল্লেখ্য, গ্রন্থে উল্লেখিত কিছু প্রমাণকে একাধিক প্রমাণে বিভক্ত করা সম্ভব। বিপরীতপক্ষে এমন অনেক প্রমাণও রয়েছে, যেগুলোকে একটি প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। তবে আমার প্রচেষ্টা ছিল পাঠক যেন খুব সহজে আলোচ্য বিষয় নিয়ে ভাবতে পারে এবং তার অন্তরে খুব সহজে বীজটি রোপিত হয়ে যায়। পাশাপাশি সুন্দর বিন্যাসে বিষয়গুলোর ক্রমান্বয় ধারাবাহিকতা বজায় রাখাও অন্যতম লক্ষ্য ছিল। অন্যথায় ওলামায়ে কেরাম তো বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুজেজার সংখ্যা বারোশরও অধিক!

সারকথা, নববি মুজেজা যেমন বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের একটি অংশমাত্র, তদ্রূপ উল্লেখিত মুজেজাসমূহও নববি মুজেজার একটি অংশমাত্র, বাকি রয়ে গেছে বহু। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

প্রথম অধ্যায়

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের প্রামাণিকতা

ভূমিকা

আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হেদায়েতের উদ্দেশ্যে প্রতিযুগে নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। তিনি তাদের আহ্বান, বাণী, জীবনাচার, বৈশিষ্ট্য তথা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই রেখেছেন আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ হওয়ার নিদর্শন। পাশাপাশি তারাও নিজেদের আচরণে ও প্রকাশে প্রভুর দূতালি করার প্রমাণ সংরক্ষণ করেছেন। তাই যে-সকল বান্দার ফিতরত ও স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য একদম নষ্ট হয়ে যায়নি, তাদের চোখে সেসব নিদর্শন অল্পবিস্তর ঠিকই ধরা পড়ত। তবে আল্লাহ তায়ালা নবুয়তের নিদর্শন হিসেবে যেমন দান করেছিলেন সূক্ষ্ম প্রমাণ, তদ্রূপ আমাদের ন্যায় সাধারণ বোধের মানুষের জন্য প্রদান করেছেন সহজ-সরল ইঙ্গিতও। এভাবে প্রতিটি মানুষের সামনেই প্রভুর বাণী পৌঁছার প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আমাদের জ্ঞানী-অজ্ঞানী কারও পক্ষেই আর ওজর-আপত্তির সুযোগ থাকেনি।

সে ধারায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর শেষ নবি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝেও দান করেন বিবিধ নিদর্শন। তাঁর নবুয়ত প্রমাণের জন্য তাঁর সত্তায়, দেহ মোবারকে, চলনেবলনে, কথায় ও আচরণে ছড়িয়ে দেন হুজ্জতের অকাট্য প্রমাণের উজ্জ্বল ছটা। যখনই কেউ তাঁর সামনে উপস্থিত হতো, গোটা প্রকৃতির নীরব সম্বোধনে ভেসে আসত, 'এ মহাপুরুষের সামনে কুরবান হতে তোমার আর কত দেরি!' বস্তুত শেষ রাসুল ও চিরস্থায়ী দ্বীনের ধারক হিসেবে তাঁর নবুয়তের প্রমাণে কোনো অপূর্ণতা ছিল না।

আমরা গ্রন্থের প্রথম পর্যায়ে শ্রেষ্ঠধর্ম ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের প্রামাণিকতা উপস্থাপনের চেষ্টা করব। এখানে যেমন উপস্থিত থাকবে অকাট্য প্রমাণ ও পূর্ণ অলৌকিকতা, তদ্রূপ পাওয়া যাবে সাধারণ যুক্তিবুদ্ধির আলোকে সত্য খোঁজার প্রচেষ্টা। উল্লেখিত নিদর্শন ও ইঙ্গিতগুলো শক্তিমত্তার দিক থেকে আপেক্ষিক বটে, তবে সামষ্টিকভাবে আমাদের স্বীকার করতে বাধ্য করে যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জ্ঞানে-গুণে-বৈশিষ্ট্যে আল্লাহর রাসুল হওয়ারই অকাট্য প্রমাণের ধারক।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহর রাসুল প্রেরিত হওয়ার সুসংবাদ ও তার প্রেরণকাল সম্পর্কিত ব্যাপক বর্ণনা ও অবগতি

আল্লাহর নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত হওয়ার ঘটনা আহলে কিতাব ও প্রাচীন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিকট মোটেও আকস্মিক ব্যাপার ছিল না। কেননা, তাদের ধর্মগ্রন্থসমূহে বেশ স্পষ্টভাবেই তাঁর আগমনের সুসংবাদ দেওয়া ছিল। ভবিষ্যতে আগমনকারী এক প্রেরিত পুরুষের ব্যাপারে সেখানে যে গুণাবলির কথা উল্লেখ ছিল, সেগুলো একমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য কারও ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা সম্ভব ছিল না। আর আল্লাহর কারিশমা এই যে, সেসব গ্রন্থ বিকৃত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও নবিজির গুণাবলিসংক্রান্ত বর্ণনাসমূহ রয়ে যায় অবিকৃতরূপেই।

ইসলামধর্মমতে, তাওরাত, জাবুর ও ইনজিল আল্লাহর পক্ষ থেকেই প্রেরিত আসমানি গ্রন্থ, যদিও একপর্যায়ে সেগুলো বিকৃত হয়ে গেছে। তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানবরচিত ধর্মগুলোর মধ্যেও কীভাবে যেন আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমনের সুসংবাদ প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যেমন, হিন্দুধর্ম, অগ্নিপূজারিদের মাজুসি ধর্ম, জরথুস্ত্রবাদ এগুলোর মধ্যেও সেই সুসংবাদ পাওয়া যায়। বস্তুত এ কথা ইঙ্গিত করে যে, এ সকল মানবরচিত ধর্মপ্রবর্তকদের নিকটও নবি মুহাম্মাদ আগমনের ঘটনা সুপ্রসিদ্ধ ছিল! সকলের নিকটই এ ছিল এক সুনিশ্চিত তথ্য।

আমরা তাওরাতের বর্ণনায় দেখতে পাই,

> এক নিরক্ষর মানুষকে আসমানি কিতাব প্রদান করা হবে। তাকে বলা হবে, 'আমি তোমার কাছে প্রত্যাশা করছি, তুমি পাঠ করো।' তখন সে বলবে, 'আমি নিরক্ষর,' অর্থাৎ, আমি পড়তে পারি না! (*সিফরু ইশাইয়া*/ (ইশাইয়া পুস্তক) : সংস্করণ, ২৯; শ্লোক, ১২ [কিং জেমস সংস্করণ])

প্রিয় পাঠক, এবার দৃষ্টি দিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর প্রথম ওহি নাজিলের ঘটনার প্রতি। হ্যাঁ, আমরা এ ভবিষ্যদবাণীর পরিপূর্ণ বাস্তবতা দেখতে পাই সেখানে। হঠাৎ জিবরাইল আলাইহিস সালাম প্রকাশিত হন নবিজির

সামনে, এবং তাকে বলেন, 'পড়ুন।' কিন্তু উত্তরে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আমি তো পড়তে জানি না।' এভাবে তারা পরস্পরে তিনবার এ কথার পুনরাবৃত্তি করেন।[২৪] এরপর হজরত জিবরাইল বলেন,

> পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।
>
> (সুরা আলাক : ১)

তাওরাতে আরও এসেছে,

> তার কথা হবে অত্যন্ত মধুর। সে মহা প্রশংসিত, আমার ভালোবাসার পাত্র, আমার একান্তজন। (*নাশিদুল আনশাদ* (পরম গীত) : সংস্করণ, ৫; শ্লোক, ১৬)[২৫]

তদ্রূপ ইনজিলে রয়েছে,

> কিন্তু আমি তোমাদের বলি, আমার চলে যাওয়াই তোমাদের জন্য অধিক মঙ্গলজনক। কারণ, আমি যদি গমন না করি, তাহলে যে তোমাদের নিকট মুআযযি (প্যারাক্লিটাস) আসবেন না! (*ইনজিলু ইউহান্না* (ইউহান্না) : সংস্করণ, ১৬; শ্লোক, ৭)[২৬]

এ ছাড়া আমরা *মাযামিরে দাউদে* (Psalms of David) দেখতে পাই,

> আল্লাহ দাউদকে বলছেন, অচিরেই তোমার (বংশে) এক সন্তান জন্ম নেবে, আমাকে তার পিতা বলা হবে আর তাকে বলা হবে আমার পুত্র। হে আল্লাহ, আপনি পথ প্রদর্শনকারীকে প্রেরণ করুন, যেন সে মানুষকে জানাতে পারে, (সেই সন্তান) একজন মানুষমাত্র (প্রভু নয়)।

তারপর পূর্ণরূপে এর বাস্তবতা প্রকাশ পায়। ইসা আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেন, তারপর আল্লাহকে তাঁর পিতা আখ্যায়িত করা হয় এবং তাকে আখ্যায়িত করা হয় তাঁর পুত্র বলে। এরপর আসেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সত্য পথ নিয়ে মানুষকে আল্লাহর এ কথা বোঝাতে যে, ইসা ছিলেন কেবল আল্লাহর বান্দা ও রাসুলমাত্র, পুত্র নন! যেমন কুরআনে আমরা দেখতে পাই,

---

[২৪]. *সহিহ বুখারি*, (৩)।

[২৫]. *নাইটিলাতুর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া-মুজিজাতুহু ফিল-সামাওয়াত*, ২৮। (এ গ্রন্থের লেখক তাওরাতের বাক্যটি ছবি সহকারে উল্লেখ করেছেন। তারপর দেখিয়েছেন, তাওরাতের আরবি অনুবাদকরা কীভাবে বাক্যটির অর্থ বিকৃত করেছে।)

[২৬]. *প্রাগুক্ত*, ৩০। উল্লিখিত 'প্যারাক্লিটাস' শব্দটি একটি গ্রিক শব্দ, যার অর্থ মুহাম্মাদ বা আহমাদ (অর্থাৎ, প্রশংসিত)।

ইহুদিরা বলে, উজাইর আল্লাহর পুত্র। আর নাসারারা বলে, (ইসা) মাসিহ আল্লাহর পুত্র। বস্তুত এসব তাদের মুখের তৈরি কথা। এরা তাদের পূর্বে যারা কাফের হয়ে গিয়েছিল তাদেরই মতো কথা বলে। এদের আল্লাহ ধ্বংস করুন! এরা কোন উলটা পথে চলে যাচ্ছে!

(সুরা তাওবা : ৩০)

অন্যত্র এসেছে,

মারয়াম-তনয় (ইসা) মাসিহ একজন রাসুল ছাড়া আর কিছু নয়। তার পূর্বেও অনেক রাসুল অতিবাহিত হয়েছে। আর তার জননী একজন ওলি। তারা উভয়েই খাদ্য ভক্ষণ করত। দেখুন, আমি তাদের জন্য কীরূপ যুক্তি-প্রমাণ বর্ণনা করছি; আবার দেখুন, তারা কোন উলটা পথে চলে যাচ্ছে! (সুরা মায়েদা : ৭৫)

নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন-সুসংবাদ সেসব আসমানি গ্রন্থে রয়েছে বলে কুরআন অত্যন্ত জোরালোভাবে আমাদের জানায়। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

যারা এ রাসুলের অনুসরণ করে, যিনি নিরক্ষর নবি, যার কথা তারা নিজেদের কাছে সংরক্ষিত তাওরাত ও ইনজিলে লিখিত অবস্থায় পেয়েছে...। (সুরা আরাফ : ১৫৭)

অন্যত্র বলেন,

যাদের আমি কিতাব দান করেছি, তারা তাকে এমনভাবে চেনে, যেমন চেনে নিজেদের সন্তানদের! নিশ্চয় তাদের একটি দল জেনেশুনে সত্যকে গোপন করে! (সুরা বাকারা : ১৪৬)

বস্তুত সেসব ভবিষ্যদবাণী বর্তমান ও প্রাচীন কালে বহু ইহুদি-নাসারার জন্য ইসলাম গ্রহণের উপলক্ষ হয়েছে।

আসমানি কিতাবের পাশাপাশি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ *শামবেদে* এসেছে,

প্রশংসিত (ব্যক্তি) বিধান গ্রহণ করেছে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, যে বিধান প্রজ্ঞার দ্বারা পরিপূর্ণ, যা গৃহীত হয়েছে আলোক হতে। (*শামবেদ*: খণ্ড, ২; শ্লোক, ৬-৮)[২৭]

এ কথার পরিপূর্ণ চিত্র হিসেবে আমরা কুরআনে দেখতে পাই,

---

২৭. প্রাগুক্ত, ৩৪।

আমি একমাত্র আমার ওপর যা অবতীর্ণ হয়, সে বিষয়েরই অনুসরণ করি। (সুরা আনআম : ৫০)

এ ছাড়াও তাদের ধর্মগ্রন্থ *অথর্ববেদে* এসেছে,

হে মানুষ, মনোযোগ দিয়ে শোনো! মানুষের মাঝে প্রশংসিত (মানব) প্রেরিত হবে। তার মহত্ত্ব প্রশংসিত হবে, এমনকি স্বর্গের মধ্যেও। (*অথর্ববেদ*: খণ্ড, ২০; পরিচ্ছেদ, ১২৭; শ্লোক, ১-৩)[২৮]

তদ্রূপ অগ্নিপূজকদের ধর্মগ্রন্থ *জেন্দাবেস্তায়* এসেছে,

অচিরেই আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতি দয়া হিসেবে একজনকে প্রেরণ করবেন। তার ওপর এক শত্রু চড়াও হবে, যার নাম অগ্নিশিখাওয়ালা (আবু লাহাব)। সেই (প্রেরিত পুরুষ মানুষকে) এক উপাস্যের বন্দনার প্রতি আহ্বান করবে।[২৯]

জরথুস্ত্রের অনুসারীদের নিকট এ কথা সংরক্ষিত আছে যে,

আরবদেশে এক পুরুষের আবির্ভাব ঘটবে। তাঁর অনুসারীরা পারস্যকে পরাজিত করবে। দাম্ভিক পারস্যবাসীকে তারা নত করবে, এবং (এত দিন) তাদের ইবাদতগৃহে আগুনের পূজার পর এবার তারা ইবরাহিমের কাবার দিকে মুখ ফেরাবে, যেটা ইতিমধ্যে মূর্তি থেকে পবিত্র হয়েছে।[৩০]

আর এ কথা কাছের-দূরের প্রতিটি মানুষই জানে, মক্কা শহরে এমন এক আরবীয় পুরুষ আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, যার অনুসারীরা সমরাঙ্গনে পারস্যকে অনবরত পরাজিত করে তাদের দেশ জয় করে নিয়েছিল এবং তাদের অগ্নি করেছিল নির্বাপিত। এরপর পারস্যবাসী মুসলমানদের কেবলা কাবার দিকে ফিরে নামাজ পড়তে শুরু করে, যা ইতিপূর্বে মূর্তি দিয়ে ভরতি ছিল, এবং ইতিমধ্যে সেখানকার প্রতিটি মূর্তিই ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়।

ব্যাপক বর্ণনা ও অবগতি

প্রকৃতপক্ষে, কান পেতে শুনলে জাযিরাতুল আরবের প্রতিটি বস্তু থেকেই গুনগুন এই সুরারোপ পাওয়া যেত যে, এখানে ঘটবে এক নবির আবির্ভাব, ঘনিয়ে

---

২৮. প্রাগুক্ত, ৩৫।

২৯. *আল-ইমান বিল-গায়েব* (*মাওসুআতুল যানাদাকি সংযুক্ত সংস্করণ*), ৪৭।

৩০. *বাইবিলাতুর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া-মুজিযাতুহু ফিল-যানাদাকি*, ৫০; *মুকাদ্দিমাতু দালাইলিন নুবুওয়াহ লিল-বাইহাকি*, ১/৪৪—(*মুহাম্মাদ ফিল আসফারিল আলামিয়্যা লিল-উসতায আবদুল হক বিদ্যার্থী* গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)।

এলো তাঁর আগমনকাল। আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের আলেম ও সন্ন্যাসী এবং গণকশ্রেণি ও বাস্তবতা তালাশকারী ব্যক্তিবর্গের মুখে বিভিন্ন সময় বহুবার এ সংবাদ শোনা গিয়েছে। যেমন—

১. যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল লক্ষ করেন, তার স্বজাতি মক্কাবাসী ভ্রষ্টতার ওপর রয়েছে। তাই তিনি তৎকালীন ইয়াসরিব ও আয়লার আহলে কিতাব আলেমদের শরণাপন্ন হন। কিন্তু তাদেরও তিনি মুশরিক হিসেবে আবিষ্কার করেন। একপর্যায়ে তিনি জাযিরার এক শায়েখের সংবাদ পান। তিনি তার নিকট আগমন করলে শায়েখ তাকে বলেন, তুমি এমন এক দ্বীনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছ, যা আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাদের দ্বীন। শোনো, ইতিমধ্যে তোমার ভূমিতে একজন নবির প্রকাশ ঘটেছে অথবা ঘটতে যাচ্ছে; তিনি তোমাদের সেই দ্বীনের প্রতি আহ্বান করবেন। অতএব, তুমি ফিরে যাও। তাঁকে সত্যায়ন করো, তাঁর অনুসরণ করো, এবং তাঁর নিয়ে আসা যাবতীয় বিষয়ের ওপর ইমান আনো।

কিন্তু যায়েদ ইবনে আমর আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবি হিসেবে আগমনের পূর্বেই ইনতেকাল করেন। তার ব্যাপারে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মন্তব্য করে বলেন, কেয়ামতের দিন সে একাই একটি জাতি হয়ে উপস্থিত হবে![২১]

২. একবার বনু আবদে আশহালের এক ইহুদি ইয়াসরিববাসীকে উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হয়। সে তাদের অবগত করে, এদিকের দেশগুলোতে একজন নবি প্রেরিত হবেন। এ বলে হাত দিয়ে মক্কা ও ইয়েমেনের দিকে ইশারা করে। শ্রোতারা তাকে প্রশ্ন করে, আমরা কখন তার দেখা পাব? তখন সে সবচেয়ে কমবয়সী বালক সালামা ইবনে সাল্লামের দিকে তাকিয়ে বলে, এই বালক নিজের জীবদ্দশাতেই তাঁর সাক্ষাৎ পাবে। সালামা বলেন, আল্লাহর কসম, (বেশি) দিনরাত্রি অতিবাহিত হলো না, এরমধ্যেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসুল হিসেবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেন।[২২]

৩. সালমান ফারসি রা.-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সকলের কাছে বেশ প্রসিদ্ধ। তিনি আল্লাহর নিকট যে ধর্ম গ্রহণযোগ্য, তার তালাশে ছিলেন। এজন্য তিনি

---

২১. আবু ইয়ালা, বাযযার ও তাবারানি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন (সূত্রনির্দেশ, *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*, ৯/৫১৫ [১৬১৮২]); *মুসতাদরাকে হাকেম*, (৫৯০৭)।

২২. ইমাম আহমাদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন (সূত্রনির্দেশ, *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*, ৮/২৩০) *মুসতাদরাকে হাকেম*, (৫৮১৯)।

একে একে অনেক আহলে কিতাব সন্ন্যাসীর খেদমতে দিন কাটান। কিন্তু প্রতিজনই মৃত্যুর সময় তাকে অন্য আরেকজনের ঠিকানা দিয়ে তার শরণাপন্ন হওয়ার উপদেশ দিতেন। এভাবে একপর্যায়ে তিনি রোমের আম্মুরিয়াবাসী একজনের নিকট উপস্থিত হন। এ সাধকেরও যখন মৃত্যু ঘনিয়ে আসে তখন সালমান ফারসি তার কাছে নতুন কোনো পথপ্রদর্শক সাধকের ঠিকানা চান। সাধক বলেন, তুমি এমন এক সময়ে অবস্থান করছ, যখন হারাম অঞ্চলে একজন নবি প্রেরিত হবেন। তাঁর হিজরতের স্থান হবে দুই হাররার (অর্থাৎ, প্রস্তরময় ভূমির) মধ্যবর্তী লবণাক্ত (ও অনুর্বর) খেজুরগাছবিশিষ্ট এলাকায়। তাঁর মধ্যে (নবুয়তের) কিছু সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকবে। তাঁর দুই কাঁধের মাঝে থাকবে মোহরে নবুয়ত। তিনি হাদিয়া ভক্ষণ করবেন, কিন্তু (ফরজ ও ওয়াজিব) দানসদকার সম্পদ থেকে খাবেন না। তাই তুমি যদি সে দেশে চলে যেতে পারো, তবে সেটাই করো। নিশ্চয় তোমার ওপর তাঁর আগমনকাল বয়ে যাচ্ছে।

তারপর সালমান রা. আরবের কিছু ব্যবসায়ীর সাথে বেরিয়ে পড়েন। তারা তাকে ওয়াদিউল কুরার এক ইহুদির কাছে গোলাম হিসেবে বিক্রি করে দেয়। এরপর ইয়াসরিব অঞ্চলের বনু কুরাইজার আরেক ইহুদি তাকে ক্রয় করে। তারপর ইয়াসরিব তথা মদিনায় আগমন ঘটে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের। তারপর সালমান রা. তাঁর মধ্যে নবুয়তের নিদর্শন খুঁজে পান এবং ইসলাম গ্রহণ করে আপন তালাশের পূর্ণতা দান করেন।[৩৩]

ইমাম বুখারি রহ. উল্লেখ করেন, সালমান রা. তেরো থেকে উনিশজন মনিবের হাতবদল হয়েছেন।[৩৪] তিনি তাদের সকলের নিকট অবস্থান করে সত্যপথ তালাশ করছিলেন। অবশেষে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে এসে পরম সফলতা অর্জন করেন।

৪. এ ক্ষেত্রে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা.-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটিও বেশ প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন, আমি বুসরার একটি বাজারে উপস্থিত ছিলাম। তখন গির্জা থেকে এক সন্ন্যাসীর আওয়াজ শুনতে পাই। তিনি বললেন, তোমরা বাজারের মেলায় জিজ্ঞেস করে দেখো তো, তাদের মাঝে হারামবাসী কেউ আছে কি না? তালহা বললেন, জি, আমি আছি। সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করলেন,

---

৩৩. *মুসনাদে আহমাদ*, ৯/১৮৫ (২৩৭৯৮); *মুসতাদরাকে হাকেম*, (৬৬০২); *মুজামুল কাবির লিত-তাবারানি* (সূত্রনির্দেশ, *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*, ৯/৪০৯ [১৫৮৩৩]), *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৩/৩১৭, *আল-ইসাবা*, ২/৬২।

৩৪. *সহিহ বুখারি*, (৩৯৪৬)।